দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 08.1999 ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শাওয়াল খান

আজ ৮ই সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত সব উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করা হয়। বাংলাদেশেও অত্যন্ত তাৎপর্যের সাথে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্ব জুড়ে নিরক্ষরমুক্ত সচেতন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ এ দিবসটি পালনের ডাক দেয়। প্রতি বছর এমনি একটা দিনে এ দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য বিগত এক বছরে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণমূলক গৃহীত কর্মসূচির সাথে নতুন মাত্রা সংযোজন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ, ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, জনমনে জাগরণ সৃষ্টি এবং প্রেরণা জাগিয়ে দেয়া ও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ১৯৬৭ সালে। দিবসটি উদ্‌যাপনের সূচনা হয়েছিল ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবী থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গৃহীত একটি প্রস্তাব থেকে। প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রথমবারের মতো পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী সাক্ষরতা পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। প্রথম পুরস্কার পান তানজানিয়ার তাবোরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১৮-১৯ বছর বয়সী ৯৫ জন তরুণী। তারা ৪০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার প্রকল্প নিয়ে ১১৩ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক একবার এ পুরস্কার পেয়েছিল। এছাড়াও ইউনেস্কো (প্যারিস) প্রথম সাক্ষরতা বর্ষ থেকে আরো ৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার দিয়ে আসছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ অন্য চারটি দেশ যথা- চাদ, ফ্রান্স, মিসর এবং উরুগুয়ের সাথে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এই পুরস্কারের মূল্যমান ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের শেষ কথা বলে কিছু নেই। সুতরাং পুরস্কার পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। যেকোন পুরস্কারই আনন্দের। পুরস্কার কর্ম-উদ্দীপনায় উৎসাহ যোগায়, কাজের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে, বাস্তবায়িত কাজকে তাৎপর্যময় করে তোলে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব সহকারে বাস্তবায়িত কাজের সফলতার স্বীকৃতি তো বটেই। তাছাড়া পুরস্কার সেই সকল কাজের প্রচারও বাড়ায়। এটা নতুন করে বলার কিছু নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয় সাংবিধানিক অঙ্গীকারও।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয় ১৯৭২ সালে। পরের বছর এ দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান ঠাকুরগাঁয় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম কচুবাড়ি কৃষ্টপুর-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এ অনুষ্ঠান ঠাকুরগাঁয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী এতে যোগ দেন। এ উপলক্ষে প্রথম গণশিক্ষা কর্মী সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। ১৯৭৪ সালে শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কুমিল্লায় এ দিবসটি পালন করা হয়। ১৯৭৭ সালে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, স্বনির্ভর বাংলাদেশের জাতীয় কমিটি, জাতীয় সমবায় পল্লী উন্নয়ন ফেডারেশন, জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি এবং সমবায় অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয়। এরপর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সফল গণশিক্ষা কর্মীদের ঠাকুরগাঁয় জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। কিন্তু ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ১৯৮৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাক্ষরতা কর্মসূচি না থাকায় সাক্ষরতা দিবসের আবেদন তেমন গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নভাবে সাক্ষরতা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হলেও তা ব্যাপক গণমানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা বিষয়ক কার্যক্রম আবার গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা'র বিশ্ব সম্মেলন ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু অধিকার বিষয়ক সম্মেলন ১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৯টি জনবহুল দেশে। সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্ব ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এ সকল সম্মেলনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়ভাবে চারটি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।

এগুলো হলো আগামী ২০০০ সাল নাগাদ -

ক) ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৯৪ ভাগে উন্নীতকরণ;

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ;

গ) প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাসকরণ; ও

ঘ) বয়স্ক সাক্ষরতা হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ।

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার এককভাবে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় নিরলসভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে সাক্ষরতার হার একটা সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ১৪-১৮ জুলাই জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বয়স্ক সেমিনারেও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং হামবুর্গ ঘোষণামতে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশেও দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি যথা বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, গণশিক্ষা মেলা, গণসঙ্গীত ও পথনাটক পরিবেশন, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পোস্টার, স্টিকার ও ফেস্টুন তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল গণশিক্ষা কর্মীদের পুরস্কার প্রদান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের আয়োজন করা হয়। সাক্ষরতা দিবস উদযাপন এবং বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কর্মসূচি কি প্রভাব ফেলে তা উদ্যোগকারীদের জানা হয়ে উঠে না। অথবা উল্লিখিত কার্যক্রম জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কতটুকু সহায়ক তাও জানা হয়ে উঠে না, গৃহীত কর্মসূচিগুলো নিয়ে গণমাধ্যমসমূহে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয় না বলে। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, শিল্পী তথা বুদ্ধিজীবীমহলকে এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যমকে পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

প্রয়োজনের তাগিদে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সম্পূরক ও সহায়ক শিক্ষা হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা জোরালো ভূমিকা রাখছে এর অবকাঠামোগত বিকাশ খুব বেশি দিনের না হলেও। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ছাত্রী উপবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়গুলোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী প্রভাব পড়বে। এছাড়াও সবার জন্য শিক্ষা আরো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সমাজের সচেতন মহল যথা শিক্ষাবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের কথা বলতে হবে। বলে দিতে হবে সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রতিপাদ্য কি হবে, উৎসব উল্লাসের সাথে পালিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের আর কি করণীয় হতে পারে, প্রতিপাদ্য হতে পারে? 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম' (ইনফেপ) চালু করা হয় ১৯৯১-৯২ সালে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে সারাদেশে বড় আকারের মোট ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার যেখানে মাত্র ৩৫.৩% সে সময় পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাক্ষরতার হার ছিল ভারতে ৮২.৫%, শ্রীলংকায় ৮৯.৩% সত্যিকার অর্থে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সাক্ষরতার বর্তমান হার ৫৬ শতাংশের বেশি। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ২০০৬ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০০২ কিংবা ২০০৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অর্থ শুধু অক্ষর জ্ঞানদানে সীমাবদ্ধ নয় একথা মনে রেখে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য, মহিলা ও উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ ধর্ম ও মূল্যবোধ, আয় ও কর্মসংস্থান, সচেতনতা ও সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তোলা সাক্ষরতা কার্যক্রমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রাণ কথা 'মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অব্যাহত শিক্ষা', ৫-৮ সেপ্টেম্বর বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ' '৯৯ উদযাপিত হচ্ছে জাতীয়ভাবে। এ উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাপক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, গণশিক্ষা মেলা, গণসঙ্গীত ও পথনাটক পরিবেশন, গণশিক্ষা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, আলোচনা সভা, সেমিনার, অনুসারক উপকরণ প্রতিযোগিতা, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সমাবেশ, পোস্টার, স্টিকার, হোর্ডিংসাইন, দুটি জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বেতার-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা। নব্য সাক্ষরদের অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষা বা অব্যাহত শিক্ষা চালু করা হয়েছে। নব্য সাক্ষরদের শিক্ষাচর্চা অব্যাহত রাখতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের ৬৪টি জেলার ৭৬টি থানার কর্ম এলাকায় ৯শ' ৩৫টি গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এতে নিয়মিত পাঠদান প্রক্রিয়া ছাড়াও রয়েছে বিনোদনের ব্যবস্থা। দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়নে গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সমাজের সচেতন জনগণকে স্বউদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে, গৃহীত কার্যক্রমে নিজেদের মতামত দিতে হবে, কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক আলোচনা পর্যালোচনা করতে হবে কার্যক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরতে হবে, ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং তা সংশোধন করতে হবে যেখানে সরকারের একার পক্ষে সম্পাদন সম্ভব নয় সেখানে সমাজের সচেতন জনগণকে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি সাক্ষরতা শিক্ষার শেষ কথা নয়। জীবনের দিক নির্দেশনা নির্ণয়ের একটা দিক মাত্র। কিন্তু জীবনের এই একটা দিকই নির্ণয় করতে পারে জীবনের অনেক মাত্রা।